পরিবেশ সুরক্ষার নামে বাণিজ্যিক স্বার্থ

অনিন্দ্য ভুক্ত

মানুষের পরিবেশ সচেতনতার ইতিহাস মাত্রই কয়েক দশকের। হাজার হাজার বছর ধরে পরিবেশকে যথেচ্ছভাবে দূষিত করে,প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে অপরিমিত উপায়ে ব্যবহার করে হঠাৎই তার খেয়াল হয়েছে পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে, মাটির তলায় প্রকৃতির ভাঁড়ার শেষ হয়ে আসছে, সভ্যতার সংকট শিয়রে উপস্থিত। এই খেয়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে কোমর বেঁধে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে পরিবেশের দূষণ রোধএবং তার সুরক্ষার চেষ্টা।

সাম্প্রতিক বহু আলোড়িত ‘বিশ্বায়ন’ আদতে একটি আর্থনীতিক প্রক্রিয়া। ‘বিশ্বায়ন’ মানে বিশ্বের সমস্ত অর্থনীতির মধ্যে একটি সহজ যোগসূত্র স্থাপন। একথা যদি বলি, বিশ্বায়নকে যদি এভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করি, তাহলে বলতে হয় এটি কোনও নতুন প্রক্রিয়া নয়। এই প্রক্রিয়া বহুকাল ধরেই চালু ছিল, থাকবেও। নতুন যেটি তা হল এই শব্দটিকে নিয়ে মাতামাতি, বা বলা ভাল, প্রক্রিয়াটিকে একটি বিশেষ চরিত্রে চিহ্নিত করা। এখন বিশ্বায়ন মানে পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ, যা কিনা অর্জন করা যাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর যে বিভিন্ন রকম বিধিনিষেধ আছে তার প্রত্যাহারের মাধ্যমে এবং সারা বিশ্বের উৎপাদন কাঠামোকে পুঁজিবাদী ছাঁচে ঢেলে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর থেকে এই যে ঢালাও বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, যাকে কিনা উদারীকরণ হিসেবেও চিহ্নিত করা হচ্ছে, পরিবেশের উপর তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিধিমুক্ত বাণিজ্যের ফলে দেশের পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর এমন দ্রব্যাদিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে দেশে ঢুকে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন অতএব পরিবেশের ক্ষতি করছে। আপাত দৃষ্টিতে এই যুক্তিকে বিশ্বায়ন - বিরোধী মনে হলেও, আশ্চর্যের ব্যাপার, এই যুক্তি প্রথম আসে উন্নত, ধনী দেশগুলির দিক থেকেই। কেন আসে তা বুঝতে গেলে জানতে হবে এইসব দেশের পরবর্তী কার্যক্রম। তার সঙ্গে জানাতে হবে সামান্য ইতিহাস।

ইতিহাস বলে, বিশ্বায়নের কথা, যে বিশ্বায়ন নাকি আবার অবাধ বাণিজ্যের কথা বলে, তার কথা উন্নত দেশগুলিই প্রথম বলে,অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডও এই নীতির কথা বলত। তবে বললেও, কাজে তারা যেটা করত তা হল অন্য দেশকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করতে বলে নিজেদের দেশের উৎপাদিত পণ্যের বাজারকে বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে রাখার চেষ্টা। সেই একই প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে এবারের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াতেও, এবং এই কাজে তাদের প্রধান হাতিয়ার পরিবেশ সুরক্ষার স্লোগান।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কথা দামের প্রতিযোগিতা। যদি ধরে নিই গুণমানের বিশেষ তফাত নেই তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে কোনও একটি দ্রব্যের রপ্তানিকারক হবে সেই দেশ, যে দেশ কম দামে জিনিসটি দিতে পারবে, অর্থাৎ উৎপাদন খরচ যার কম।এই যদি হয় তাহলে কিন্তু ভারতের মতো বিকাশশীল দেশের বড় ধরনের রপ্তানিকারক হওয়া উচিত ছিল। হয় যে নি, তার দুটি কারণ। প্রথমত, গুণমানের কোনও তফাত নেই ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে অন্য উন্নত দেশের পণ্যের, এটা নেহাতই অনুমান হতে পারে, বাস্তব নয়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন খরচ কম হবার জন্য যে সুবিধা দাম প্রতিযোগিতায় ভারতের পাওয়ার কথা তা ভোঁতা করে দেয় উন্নত দেশগুলি শুল্ক বসিয়ে।

সমস্যা হল ১৯৯৫ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা কাজ শুরু করার পর থেকে। যে গ্যাট চুক্তির ফলশ্রুতি এই সংস্থা, সেই চুক্তি অনুযায়ী সব দেশকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর থেকে যাবতীয় শুল্ক সংক্রান্ত বাধা সরাতে হবে। সরাতে হবে ঠিকই, কিন্তু সরালে তো চলে না আমেরিকা বা ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মতো উন্নত দেশের প্রতিনিধিদের। অতএব চাই কূটকৌশল এবং মানুষের নবজাগ্রত পরিবেশ চেতনা, যা কিনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মঙ্গল চিন্তা করেছিল, হয়ে গেল উন্নত বিশ্বের কুট রাজনীতির হাতিয়ার।

বিকাশশীল দেশগুলির রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জন্য তৈরি শুরু হল পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত যোগ্যতামান। এই যোগ্যতামানে উত্তীর্ণ হতে পারলে রপ্তানি করো, নইলে ঘরের জিনিস ঘরে ফেলে রাখো। সবচেয়ে বড় কথা, পণ্যের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য দিয়ে এতদিন পণ্যের গুণমান বা পণ্যটি স্বাস্থ্যসম্মত কিনা বিচার করা হত সেগুলিকেও বেমালুম পরিবেশ - সংক্রান্ত মান হিসেবে চালিয়ে দেওয়া শুরু হল। উদাহরণ হিসেবে চায়ের কথাই বলা যাক, কারণ এই বিতর্ক চলছে তাও তো প্রায় বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। প্রথমে ওঠে ১৯৯৪ সাল নাগাদ। ঐ বছর বেশ কিছু চা ইউরোপের দেশগুলি থেকে ফেরত আসে। জার্মানি অভিযোগ তোলে ভারতীয় চায়ে বিষাক্ত রাসায়নিকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে।

ইথিয়ন, কুইনালফোস, ট্যাট্রিডিফোন, ক্লোরোপাইরিফমের মতো রাসায়নিক যতটা পরিমাণ থাকার কথা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ থাকে (সূত্র দ্য স্টেটসম্যান, সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৯৪)। জার্মানির অভিযোগটি ভারতের পক্ষে মারাত্মক ছিল তার কারণ সেই সময় কেবলমাত্র জার্মানিতেই ভারতীয় চায়ের রপ্তানির পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ৫০০০ টনেরও বেশি। পরবর্তীকালে জার্মানির এই অভিযোগের সূত্রে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চায়ের রপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এই সময় থেকে ভারতীয় চা কোম্পানিগুলি একটু উদ্যোগী হলে চায়ে কীটনাশকের মাত্রা কমে আসে এবং রপ্তানিও আবার একটু বাড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর আবার নতুন করে হুমকি দেওয়া হয়েছে ভারতীয় চায়ে কীটনাশকের মাত্রা আরও না কমালে আর চা কেনা হবে না (সূত্র আনন্দবাজার পত্রিকা, মার্চ ৮, ২০০৩)। অবশ্য এবার শুধু চা নয়, কীটনাশকের মাত্রা না কমালে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে কৃষিজাত খাদ্য সামগ্রী ও তরিতরকারির উপরও। ব্যবহার নিষিদ্ধ এমন ৩২০টি কিটনাশকের তালিকাও ভাতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। চায়ের ক্ষেত্রে কীটনাশকের উপস্থিতির মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, প্রতি কিলোগ্রাম চায়ে তিন মিলিগ্রাম। শুধু তাই নয়, এইসব বায়নাক্কা যারা তুলেছে সে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনে এও বলা হয়েছে যে, কোন কোন কীটনাশক ব্যবহার করে চা তৈরি করা হচ্ছে তা আগে থেকে ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলিতে নথিবদ্ধ না করালে সে চা ইউরোপের বাজারে বিক্রি করা যাবে না।

একটু ভাল করে খেয়াল করলেই এইসব বায়ানাক্কার কারণটি বোঝা যাবে। ভারতীয় চায়ে কীটনাশকের উপস্থিতি মাত্রাতিরিক্ত কি নয় সেটি পরের প্রশ্ন। কারণ চা শিল্পের একাংশের বক্তব্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঠিক বলছে না, অন্যদিকে বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অভিযোগের সত্যতা আছে। আমরা যদি দ্বিতীয়টিই সত্যি বলে ধরে নিই তাহলেও তো প্রশ্ন ওঠে যে এতদিন এই প্রশ্ন তোলা হয়নি কেন?বস্তুত ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরই ভারতীয় চায়ের উপর আক্রমণ শু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ভারতীয় চায়ের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। সেই বাজার নষ্ট হয়ে যাবার পর বিপন্ন ভারতীয় চা শিল্পকে আরও আহত করতেই ইউরোপীয় ইউনিয়েনের এই আক্রমণ। আসলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে (বিশেষত বিশ্ব - বাণিজ্য সংগঠনে) কৃষিপ্রধান দেশ ভারতকে কোনঠাসা করতেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের আন্তর্জাতিক কৃষিপণ্যের বাজারটিকে ধরে রাখতে মরীয়া প্রায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে শ্রীলংকা, কিনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনামের মতো দেশ, চায়ের উৎপাদন বাড়িয়ে যারা ক্রমশই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে।

কৃষিপণ্য রপ্তানিতে সাধারণত সুবিধা ভোগ করে কৃষিপ্রধান বিকাশশীল দেশগুলি। কোনও কৃষিপণ্য উন্নত দেশগুলি আমদানি করার সময় সেই ফসলে কীটনাশকের উপস্থিতি কতটা সেটা তো দেখতই, এবার শু হল যাচাই করা। যে গাছের ফলটা রপ্তানি করাহচ্ছে সে গাছটি কতটা সুস্থ, তাতে জৈব না রাসায়নিক কোন্ সার ব্যবহার করা হয়েছে থেকে শু করে সেই গাছের ফলটি আমদানিকারী দেশের মানুষের স্বাস্থ্যর পক্ষে কতটা নিরাপদ, মানে দেশের মানুষ সেই খেয়ে হজম করতে পারবে কি না, তা পর্যন্ত বিচার করা শু হল। বলা বাহুল্য, বিচারের এমন সব মাপকাঠির সাহায্যে বিকাশশীল দেশগুলির রপ্তানি বন্ধকরে দেওয়া নেহাতই মামুলি কাজ। সবচেয়ে বড় কথা, এতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না, আবার দেশিয় উৎপাদনকে সুরক্ষিত করে রাখাও সম্ভব হয়।

কিন্তু কখনও কখনও এইসব করেও যখন বিকাশশীল দেশগুলির রপ্তানি আটকানো যাচ্ছিল না, মানে উন্নত দেশগুলির রপ্তানিআটকানো যাচ্ছিল না, মানে উন্নত দেশগুলির নির্ধারিত মানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিকাশশীল দেশগুলি যখন ব্যবস্থাদি নিচ্ছিল, তখনউন্নত দেশগুলির পরিবেশ চেতনা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পরিবেশের সুরক্ষা চেতনা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পরিবেশের সুরক্ষা মানেতো শুধুমাত্র নিজেদের দেশের পরিবেশের সুরক্ষা নয়, পরিবেশ একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। অতএব বিকাশশীল দেশগুলি থেকে কিছু আমদানি করার সময় দেখতে হবে দেশের পরিবেশ দূষিত করে তারা জিনিসটি উৎপাদন করছে কিনা। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—ভারতের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের তালিকায় চিংড়ি এবং চিংড়িজাত খাদ্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। এই রপ্তানিকে আটকাতে ১৯৯৮ সালনাগাদ বিশ্ব - বাণিজ্য সংগঠনের 'বিবাদ মীমাংসা কর্তৃপক্ষ' -এর কাছে আমেরিকা অভিযোগ করে বসে যে ভারত নিয়ম লঙঘন করে চিংড়ি উৎপাদন করছে। কী নিয়ম, না চিংড়ি উৎপাদনের জন্য তারা সামুদ্রিক কচ্ছপের সুরক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থাদি নেয় না। এই অভিযোগের শুনানির পর অবশ্য এমন হাস্যকর অভিযোগ বাতিল করে দেওয়া হয়।

তবে তাতে পরিস্থিতির কিছু বদল হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। উন্নত দেশগুলি জানে এভাবে শেষ রক্ষা হয় না, আবিষ্কার করেযেতে হয় নিত্যনতুন। ফলে বিকাশশীল দেশগুলির পরিবেশ সুরক্ষায় দায় মাথায় নেবার পর ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে সামাজিক পরিবেশের দিকে তাদের নজর পড়ল। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

ভারতীয় একটি কোম্পানি। ইউরোপের বহু শাখাবিশিষ্ট একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এরা বীজবিহীন আঙ্গুর রপ্তানি করে। রপ্তানি করার আগে এখন তাদের একটি ফর্ম ভরতে হচ্ছে। কোম্পানিতে কাজের পরিবেশ কেমন, কোম্পানির কর্মীদের অবস্থা কেমন, কোম্পানিটিতে কাজের শর্তাবলী কী কী, কোম্পানির কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে কিনা— এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ভরতে হচ্ছে সেই ফর্মে।অ-শুল্কীয় বাধার সাহায্যে বিকাশশীল দেশগুলির রপ্তানি বৃদ্ধিকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা কত দুরন্ত হয়ে উঠেছে তা সম্ভবত এই একটিমাত্র উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বস্তুত পরিবেশ সংক্রান্ত অ-শুল্কীয় বাধার তালিকায় আস্তে আস্তে যাবতীয় বিষয়ই হাজির করে ফেলছে উন্নত দেশগুলি। পরিবেশের সুরক্ষা, বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ, গাছের স্বাস্থ্য, মানুষের স্বাস্থ্য, মানুষের নিরাপত্তা — এই সমস্ত দিকই বিবেচনা করে উৎপাদন করতে হবে এমন থেকে এবং যদি করা যায় তবেই তা রপ্তানি করা যাবে উন্নত দেশগুলিতে। খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে যেমন, খাদ্যটির গুণগত মান কেমন, তা কতটা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে উৎপাদন করা হয়েছে, কী কী উপাদান নিয়ে তা তৈরি করা হয়েছে, ঠিকমতো প্যাকেট করা হয়েছে কিনা, খাদ্যটি কবে উৎপাদন করা হয়েছে, কতদিন পর্যন্ত তা ভাল থাকবে, এইসব তথ্য প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত করা হয়েছে কিনা -- সব কিছু দেখেই তবে তাকে দেশে ঢোকার অনুমতি দেবে উন্নত বিশ্ব।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এইসব করে মোদ্দা ফলটা কী হচ্ছে? প্রাথমিকভাবে একটা জিনিস পরিষ্কার যে এর ফলে বিশ্বায়নের উদ্দেশ্যটাই ব্যাহত হচ্ছে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য খোলামেলা পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যটা। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটি, সেটি হচ্ছে বিকাশশীল দেশগুলির। তাদের রপ্তানিকারকদের উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে যাচ্ছে। প্রথমত, উন্নত দেশগুলি বিভিন্ন পণ্যের পরিবেশগত যে মান ঠিক করে দিচ্ছে তা বজায় রেখে উৎপাদন করতে গেলে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভারতের মতো দেশ, সস্তা শ্রমের জোরে যারা দামের প্রতিযোগিতায় সুবিধে পেয়ে রপ্তানি করতে পারছিল, তারা সেই সুবিধাটুকু হারিয়ে ফেলছে। দ্বিতীয়ত, পণ্যের পরিবেশগত মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ওপ্রযুক্তি আমদানি করতে হচ্ছে বিদেশ থেকে। এতে একদিকে খরচ তো বাড়ছেই, অন্যদিকে নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে কারখানার প্রযুক্তির মান উন্নত করে নিতে যে দীর্ঘ সময় লাগছে সেই সময়ের জন্য কারখানা বন্ধ রাখতে হচ্ছে। সম্প্রতি যেমন, ভারতে যে চার শতাধিক কারখানা মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে তার ৭৫ শতাংশ বন্ধ করে রাখা হয়েছে কারখানার প্রযুক্তির মান বাড়ানোর প্রয়োজনে। এর ফলে খরচ বাড়ার থেকেও ক্ষতি হচ্ছে এই অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যেই ফার্মগুলি তাদের দীর্ঘদিনের বাজারগুলি হারিয়ে ফেলছে। পরিবেশ সংক্রান্ত অশুল্কীয় বাধাগুলি আরোপের ফলে আরেকটি যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা শুধু রপ্তানিকারকদের নয়, সামগ্রিকভাবে দেশের। আমদানি বেড়ে যাওয়ায় একদিকে যেমন বিদেশি মুদ্রাভান্ডারে চাপ পড়ছে তেমনি চাপ পড়ছে লেনদেন ব্যালান্সের উপরেও।

পণ্যের পরিবেশগত মান বজায় রাখার বিষয়ে এতগুলি সমস্যার কথা বলার পর কারও মনে হতেই পারে আপত্তিটা যেমন পরিবেশ সুরক্ষার প্রশ্নে তা নয়। ঘটনা হচ্ছে, কোনও পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে যদি পরিবেশ দূষণের ব্যাপারটি সত্যিই জড়িয়ে যায় তাহলে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই সেই পণ্য উৎপাদনের আপত্তি তুলবে, অন্তত যে পদ্ধতিতে পণ্যটি উৎপাদিত হচ্ছে সে পদ্ধতির প্রশ্নে। বাস্তবেযা হচ্ছে, তথ্য যা বলছে, তা এই যে আপাতত মোটামুটি ১৮৫ টির মতো পণ্যকে সারা বিশ্ব জুড়ে এই ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এবং সবচেয়ে মজার কথা হল, এই ১৮৫টি পণ্য যে সমস্ত দেশেই আটকে যাচ্ছে তা নয়। এর অর্থ, অতএব, যে সমস্ত দেশ এইসব বিধিনিষেধ আরোপ করছে তারা পরিবেশ সুরক্ষা স্বার্থে এগুলি আরোপ করছে তা নয়। করছে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে, পরিবেশ সুরক্ষা অজুহাত মাত্র। আমাদের আপত্তি ঠিক এই জায়গাটিতেই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com